দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 MAY 2005 —
পৃষ্ঠা - ১ ... কলাম ৬ ....

শিক্ষা এখন পণ্য, বৈষম্যের প্রাচীর ।। প্রাথমিকেই ১১ ধারা, অর্জন কতটা?

শরিফুজ্জামান পিন্টু ।। বিভূতিভূষণের কালজয়ী 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালা এখন বিবর্ণ স্মৃতি। নিশ্চিন্তপুর গ্রামের দারিদ্র্য শিশু অপু'র শিক্ষা সংগ্রাম পথের পাঁচালী অবলম্বনে রুপালি পর্দায় দেখিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। মুদি দোকানের পাশে খোলা ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে বসত অপু ও তার সহপাঠী খুদে শিক্ষার্থীরা। এর পরও অপুরা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এখন?

একাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ ছাড়াও কোচিং, গাইড অবলম্বন করেও আজকের শিক্ষার্থী নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না।

(৬ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা এখন পণ্য

(প্রথম পাতার পর) বেশিরভাগই প্রবেশ করতে পারে না প্রকৃত জ্ঞানের রাজ্যে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না কর্মজীবনে। তাই এ প্রশ্নটিও অনিবার্যভাবেই আসে—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, কাঁড়িকাঁড়ি বৈদেশিক সাহায্য, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা কতটুকু এগিয়েছে?

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং তা সাভারের নয়তলা গার্মেন্টস ভবনের মতো ধসে পড়েছে। শিক্ষায় বরাদ্দ অপর্যাপ্ত, যতটুকু আছে তারও সদ্ব্যবহার নেই। শিক্ষক নিয়োগে টাকা বা রাজনীতিই প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষার কোথাও কোন রকম তদারকি নেই।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন নয়। মোট এগারো ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ধারা রয়েছে। যেসব অভিভাবকের উপার্জন বেশি তাঁর সন্তান পড়বে অভিজাত প্রতিষ্ঠানে, মধ্যবিত্ত শিশু পড়বে মধ্যম মানের প্রতিষ্ঠানে। এভাবে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিঃস্ব সবার জন্যই আর্থিক অবস্থা অনুপাতে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার স্বীকৃত ১১ ধরনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, আনরেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুলের পাঠ্যবই ভিন্ন, পড়াশোনার মান ও ধরন একেকটি একেক রকম। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন শিশু পড়ে, 'আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই' তখন কিন্ডারগার্টেনের শিশু পড়ে, 'হামটি ডামটি স্যাট অন এ ওয়াল/ হামটি ডামটি হ্যাড এ গ্রেট ফল'। আবার এবতেদায়ী স্তরের শিশু পড়ে আলিফ-আল্লাহ ছাড়া উপায় নেই।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, প্রসাধনে আমাদের শিক্ষার অসংখ্য ক্ষত ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, একই রাষ্ট্রে শিক্ষার একাধিক ধারা থাকা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি ড. কুদরত-ই-খুদা, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদের মত উল্লেখ করেন। গবেষক অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, প্রাইমারী থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কোন স্তরে একই পদ্ধতির গণমুখী শিক্ষা নেই, যেটি এ দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান মনে করেন, শিক্ষার বহুমুখী ধারার কারণে একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পৃথক পৃথক সমাজ গড়ে উঠছে, যা খুবই বিপজ্জনক।

সম্প্রতি সুইডেন গিয়ে শিশু শিক্ষার ধরন দেখার সুযোগ হয়। সেখানে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা বেতন বা ফী মুক্ত। ধনী-দরিদ্রের জন্য পৃথক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই। সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশী ডা. মাহবুব সিদ্দিকী এবং ইয়াসমিন তাহেরা দম্পতির পুত্র স্পন্দন। বেশ হাসিখুশি ও চটপটে এই শিশুটি নিজ দেশে থাকলে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। ওকে এখনও ডে কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়। স্পন্দনের কাছে জানতে চাই, ডে-কেয়ার সেন্টারে সেদিন সে কি শিখেছে? তার বর্ণনা শুনে অভিভূত হই। সেদিন ওদের পাহাড়ে নেয়া হয়েছিল পিঁপড়ার জীবনচক্র দেখাতে। সরেজমিন ওরা দেখেছে পিঁপড়ার চলাফেরা, খাদ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, বাসা, পিঁপড়া রানীর গতিবিধি প্রভৃতি। স্পন্দনের বাবা ডা. মাহবুব সিদ্দিকী বলেন, বাসায় এসে ওর পড়ার দরকার তেমন একটা হয় না। নিজ চোখে যা দেখে আসে, শিক্ষকের কাছে যা শুনে আসে, তা গল্পের মতো করে শোনায়। স্পন্দনের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হয়, আমাদের দেশে নবম বা দশম শ্রেণীতে পিঁপড়ার জীবনচক্র সম্পর্কে একজন শিক্ষার্থী যতটুকু ধারণা পায় তা এই শিশুটি বিদ্যালয়ে যাবার আগে শিক্ষা কৌশলের কারণেই রপ্ত করেছে।

উন্নত বিশ্বে বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুর আনন্দের স্থান। হাসি-গান ও খেলাধুলার মধ্যে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। আমাদের শিক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার প্রাধান্যই বেশি, যে কোনভাবেই হোক বিদ্যা গলাধঃকরণ এবং তা পরীক্ষার খাতায় লেখা। একগাদা নিকৃষ্টমানের বই-খাতার বোঝা তুলে দেয়া হয় শিশুর মাথায়।

এমনকি গাইড বইয়ের স্তূপ, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর হয়ে ওঠে শিক্ষার অনুষঙ্গ। এ ধরনের লেখাপড়া শিশুমনে দৈত্য-দানবের মতো আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে অবুঝ শিশুর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা এবং ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠার করুণ ছবি আমাদের পত্রপত্রিকায়ও ফি বছর ছাপা হয়। চকোলেট, পোশাক, খেলনা থেকে শুরু করে নানা প্রলোভন দিয়ে মা-বাবা ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে, এমনকি উদ্বিগ্ন অভিভাবকের নিষ্ঠুর বকাঝকা-ভর্ৎসনা পর্যন্ত শিশুকে হজম করতে হয়। পুঁথির চাপে এবং চাপানো বিদ্যার ভারে শিশুকে মৃতপ্রায় করে তোলেন তারাই সবচেয়ে আপনজন।

মদন মোহন তর্কালঙ্কার বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিশু শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্য এখন আর শিক্ষার্থীর হাতে দেখা যায় না। 'সদা সত্য কথা বলিবে' জাতীয় নীতিবাক্য এখনকার শিশুদের কাছে সেকেলে। শুরুতেই এখন সিংহভাগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় ঝকঝকে বই, ডায়েরি, খাতা-কলম, আর্ট পেন্সিল, শার্পনার, স্কুল ড্রেস, দামী ব্যাগ, ওয়াটার পট আরও কত কি! স্কুল খরচ ছাড়াও সকাল-বিকাল প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টার। এভাবে শিক্ষার সঙ্গে অর্থের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অপ্রতিরোধ্য যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরেই প্রাধান্য পাচ্ছে বাণিজ্যিক ও বেনিয়া দৃষ্টিভঙ্গি। খই ফোটার মতো শিশুর মুখে ইংরেজী ফুটতে হবে, একটি আসনের জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাটজনের ভর্তিযুদ্ধে শিশুকে যে কোনভাবে উপযোগী করতে হবে—এটিই এখন মুখ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে বলা হয়, 'ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট নেয়া এবং তাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলা।' অর্থাৎ বইপত্রের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং পড়াশোনাকে ভালবাসতে শেখা। বাস্তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আক্ষরিক অর্থে এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমন গুণে, তেমন ওজনে। শিশুরা বইপ্রীতির চেয়ে বই ভীতিতেই আক্রান্ত।

দেশের শিশু শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিশুরা প্রকৃতিগতভাবে খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি ভালবাসে। জীবনে প্রথম সে যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তার কল্পনার জগতে বিদ্যালয় একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের মনোজগতের এ চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এর সঙ্গে যখন বিদ্যালয়ের কড়া অনুশাসন যুক্ত হয় তখন পুষ্টিহীন-ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুটি ভীতসন্ত্রস্ত হতোদ্যম হয়ে পড়ে।